বাংলাদেশে শিশু শিক্ষা: কাজলী মডেলের অসাধারণ সাফল্য

বাংলাদেশের শিক্ষা খাত সম্পর্কে অনেকেই হতাশা ব্যক্ত করেন যে শিক্ষার প্রসার বাড়লেও মান বাড়ছে না। এ ব্যাপারে আরো মনোযোগী না হলে দেশের উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ হবে। তবে এ ক্ষেত্রে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন আমাদের আশার আলো দখাচ্ছে। দেশের সকল শ্রেণির জনগণের মধ্যে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ দৃশ্যতঃ বৃদ্ধি পেয়েছে। সমাজের সবচেয়ে সুবিধাবঞ্চিত ও নিম্নবিত্ত পরিবারের শিশুরাও এখন শিক্ষামুখী হয়েছে। এইসব শিশুদের জন্যে সরকারী ও বেসরকারী নানা ধরনের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হয়েছে, যার মাধ্যমে শিশুরা স্কুলগামী হয়ে উঠছে। এর বাইরেও আরো একটি অত্যন্ত ব্যতিক্রমী ও আশাবাদী ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে যার মাধ্যমে সমাজের নিজস্ব প্রচেষ্টায় দেশব্যাপী শিশু শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন হচ্ছে। অর্থাৎ বাইরের আর্থিক সহায়তা ছাড়াই স্থানীয় সমাজের একান্ত উদ্যোগে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিশু শিক্ষা কেন্দ্র গড়ে উঠছে।

আমি নিজেই এ রকম একটি ব্যবস্থার সঙ্গে গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে সম্পৃক্ত আছি। ব্যবস্থাটির নাম কাজলী মডেল শিশু শিক্ষা কার্যক্রম। ২০০৩ সাল থেকে শুরু হওয়া মডেলটির মাধ্যমে সারা দেশে এক সময় দেড়শোটির বেশি কাজলী শিশু কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল, যা ২০২০-২১ সালের ভয়াবহ করোনা সংক্রমনের সময় স্বাভাবিক কারণেই হ্রাস পেয়ে বর্তমানে প্রায় ১০০টির কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে। দুই দশকের বেশি সময় ধরে পরিচালিত এই কেন্দ্রগুলো থেকে প্রায় দেড় লাখ শিশু স্কুলগামী হয়েছে। এদের মধ্যে অনেকেই স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটির গন্ডী পার হয়ে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে। আবার বলি, কেন্দ্রগুলোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে যে এগুলো প্রায় সম্পূর্ণভাবে সমাজের নিজস্ব সামর্থ্য ও প্রচেষ্টায় পরিচালিত হয়। শুধু মডেলটিতে ব্যবহৃত শিক্ষা-উপকরণ, শিক্ষিকা-প্রশিক্ষণ ও কেন্দ্রগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধনের ব্যাপারে বাংলাদেশের অন্যতম গবেষণা প্রতিষ্ঠান রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ (রিইব) সহযোগীতা প্রদান করে।

আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভাষাবিজ্ঞান-বিষয়ে স্নাতক শিক্ষা শেষ করার পরপরই জানতে পারি কাজলী মডেলের কথা। দেশের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে সুবিধাবঞ্চিত, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও স্থানীয় জনগণের নিজস্ব প্রচেষ্টায় পরিচালিত এ ধরনের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা মডেলের ব্যাপারে স্বাভাবিক আকর্ষণ বোধ করি। জানতে পারি মডেলটি উদ্ভাবণের সঙ্গে জড়িত রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্ বাংলাদেশ (রিইব)-এর পরিচালক মন্ডলীর সভাপতি ডঃ শামসুল বারি নিজেই। তিনি দীর্ঘ সময় দেশের বাইরে বিভিন্ন দেশে শিক্ষকতা করে ও তারপর জাতিসংঘের সঙ্গে দু দশকের বেশী কাজ শেষ করে ১৯৯৯ সালে দেশে ফিরে আসেন ও সমাজ উন্নয়ণমূলক বিভিন্ন কাজে লিপ্ত হন। তাই তার সঙ্গে দেখা করে এ ব্যাপারে

কাজ করার বাসনা জ্ঞাপন করি। ২০১৩ সালের নভেম্বর থেকে যাত্রা শুরু করে আজও মহানন্দে আমি কাজটির সঙ্গে যুক্ত আছি। এখানে বলে রাখি যে কাজলী মডেলের নামকরণ হয়েছে মাগুরা জেলার শ্রীপুর উপজেলার কাজলী গ্রামের নাম থেকে। ডঃ শামসুল বারির পৈতৃক গ্রাম, যেখান থেকে মডেলটির প্রাথমিক গবেষণার কাজ শুরু হয় ২০০৩ সালে।

এবার মডেলটির শিক্ষাদান প্রক্রিয়ার অভিনবত্বের ব্যাপারে কিছু বলি। কাজলী মডেল হলো ৪ থেকে ৫ বছর বয়সী শিশুদের জন্য এক বছর মেয়াদি একটি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা। মডেলটির মূল উদ্দেশ্য হলো অতি আনন্দময় ও আকর্ষণীয় শিশু-বান্ধব শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে শিশুকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য তৈরি করা এবং তার জন্যে শিশুর মন থেকে শিক্ষা ভীতি দূর ক'রে শিশুকে আত্মবিশ্বাসী ক'রে গড়ে তোলা। 'শিক্ষা আনন্দময়' নীতিতে পরিচালিত এ ব্যবস্থায় বই-খাতা কলম-পেন্সিলের কোনো ব্যবহার নেই। শিশুরা খালি হাতে কেন্দ্রে এসে পকেট কার্ড, পকেটবোর্ড ও ব্ল্যাক বোর্ডের মাধ্যমে বিভিন্ন ধাপে অক্ষর, বর্ণ, শব্দের সাথে পরিচিত হয়ে, সহজেই বাংলা ও ইংরেজি পড়তে ও লিখতে শিখে যায়। দু মাসের মধ্যেই শিশুরা কীভাবে শব্দ, বাক্য ইত্যাদি তৈরী হয় বুঝে ফেলে। ফলে কোথাও কিছু লেখা দেখলেই পড়তে চায়। বাংলা ও ইংরেজি দুই ভাষাতেই। আর ইংরেজি ভাষা শিক্ষা ব্যবস্থাটি এমনভাবে দাঁড় করানো হয়েছে যে শিক্ষিকারা ভাষাটিতে দক্ষ না হয়েও বাংলায় লেখা শিক্ষিকা-ম্যানুয়েল ব্যবহার করে শিক্ষাদান করতে পারে। পদ্ধতিটিতে শিশুরা ছবির সাহায্যে ইংরেজি বর্ণ, অক্ষরের সঙ্গে পরিচিত হয়ে, ছড়ার মাধ্যমে ভাষাটির মূল ব্যাকরণ কাঠামো অত্যন্ত সহজে রপ্ত করে, ইংরেজি পড়তে লিখতে, গণনা করতে, ছড়া বলতে ও নিজেদের সম্বন্ধে ইংরেজিতে কিছু বলার দক্ষতা অর্জন করে। ফলে শিশুর বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন ও স্থানীয় জনগণ কাজলী মডেলের প্রতি আকৃষ্ট হন। নিকটবর্তী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কাজলী শিশুদের নিজেদের ক্লাসে ভর্তির জন্যে উন্মুখ হন। শীঘ্রই দেখা যায় কাজলীর শিশুরা ক্লাসে সবচেয়ে বেশী এগিয়ে। এর ফলে কাজলী শিক্ষিকাদের মাসিক সম্মানী অর্জন সহজতর হয়।

কাজলী পদ্ধতিতে পাঠদানের বিভিন্ন ধাপ, ছড়া, কবিতা গান ও শরীরচর্চা, খেলাধুলা প্রভৃতি শিশুর আত্মবিশ্বাস, নেতৃত্বের বিকাশ, শারিরীক ও মানসিক বিকাশসহ শৃঙ্খলাবোধ বাড়ায়। তাছাড়া প্রত্যেক শিশুর মা বা অভিভাবকরা পালা করে প্রতিদিন শিশুদের দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করেন। স্থানীয় সমাজই শিশুদের জন্যে কেন্দ্রঘর ও সেখানে বসার ব্যবস্থাসহ কেন্দ্রের সামগ্রিক দেখাশোনা করে।

আমার মনে আছে, ২০১৪ সালের জানুয়ারিতে প্রথম কাজলী কেন্দ্র পরিদর্শনে সৈয়দপুর পৌঁছাই। পরের দিন খুব কুয়াশা আর ঠাণ্ডায় নীলফামারী সদরের কয়েকটি কেন্দ্রে যাই। প্রত্যন্ত গ্রামে কনকনে শীতে ছোট ছোট শিশুদের হাসিমুখ। পাশের বাড়ির কয়েকটা বাচ্চা দৌঁড়ে কেন্দ্রে চলে এলো। তারপর একচালা কেন্দ্র ঘরের মাটির মেঝেতে

চট/বস্তায় বসে পড়ল। ওদের হাসি ও আনন্দ দেখে মনে হলো শীতের ব্যাপারে ওদের কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। এরপর, 'এটা কীসের ছবি...?', মাছ, তাল, ডাব, ইট.., 'কাজলী সাথী বন্ধুরা আমি কী মাছ-এর ছবি তৈরি করতে পেরেছি?, 'হ্যাঁ পেরেছো'। সশব্দ হাত তালি আর শিশুদের হাসি-উচ্ছ্বাসের ঢেউ শীতের হাওয়ায় প্রতিধ্বনিত্ব হচ্ছিল। একে একে বাংলা, ইংরেজি, ছড়া-কবিতায় শিশুরা সময় পার করছিল। শিশুদের খেলার ছলে পড়তে লিখতে পারার এই বিষয়টি তাদের আত্নবিশ্বাস ও শিক্ষামুখী হওয়াতে বিশেষ অবদান রাখে মর্মে শিক্ষিকা ও মায়েরা বলেন, কাজলী কেন্দ্রে শিশুরা ভয় পায় না, সাহস নিয়ে কোনটা কী বর্ণ বা শব্দ সহজেই বলতে পারে এবং নিজেরাই অধিকাংশ বর্ণ লিখতে শিখে যায়, বছরের শুরু থেকেই নতুন শব্দ তৈরির কৌশলও রপ্ত করে নেয়। কেন্দ্রের দেয়ালজুড়ে ব্ল্যকবোর্ডগুলো শিশুদের সৃজনশীল অঙ্কন প্রকাশের মোক্ষম স্থান। মায়েরা আরো জানান, কেন্দ্রটি বাড়ির কাছে বলে বাচ্চাদের যাওয়া-আসার জন্য সুবিধে, মায়েরা সহজেই কেন্দ্রের দেখাশোনা করতে পারে, শিশুদের খাবার জোগাতে পারে ও সার্বিকভাবে কেন্দ্র পরিচালনা করতে পারে। তারাই কেন্দ্রের মালিক।

কাজলীর প্রতিটি কেন্দ্রে শিক্ষার ও সমাজের অংশগ্রহণের চিত্র একই। ২০১৪ থেকে করোনা পূর্ববর্তী সময়ে আমি প্রথমে সহকারী শিক্ষা অফিসার ও পরে শিক্ষা সমণ্বয়কারী হিসেবে কাজ করেছি। এ সময়ে দেড়শোটির বেশি কেন্দ্র বারবার পরিদর্শন, কেন্দ্রের শিক্ষিকা ও সমাজের মানুষের সাথে যোগাযোগ, কারিগরি সহায়তা প্রদানে শিক্ষিকাদের জন্য বাংলা, ইংরেজি, গণিত নির্দেশিকা সংযোজন, পরিমার্জন ও শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণ প্রদান, নথিভূক্তি ও প্রকাশনা প্রভৃতি কাজে সম্পৃক্ত থেকেছি। কেন্দ্র পরিদর্শনকালে সমাজের মানুষকে শিশু শিক্ষায় উজ্জীবিত করতে হয়েছে, কারণ কাজলী মডেল ব্যবস্থা স্থাপনের প্রথম দিকে সকলের একটা ধারণা ছিল যে, শিক্ষার দায়িত্ব সরকারের বা কিছু বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের যারা শিক্ষা নিয়ে কাজ করে। তারাই শিশু শিক্ষার পুরো দায়িত্ব পালন করবে। তাই সমাজকে বোঝাতে হয়েছে, শিশু শিক্ষার দায়িত্ব সবার, একটা শিশুর সামগ্রিক উন্নয়নে সবাইকে সহযোগিতা করতে হয়। আর সংশ্লিষ্ট সমাজ যখন দায়িত্ব ও মালিকানা নিয়ে শিশু শিক্ষায় অবদান রাখে তার সদূরপ্রসারী ইতিবাচক প্রভাব সমাজ ও তথা দেশে প্রতীয়মান হয়। বর্তমানে শিশু শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আগের চেয়ে সচেতনতা বেড়েছে। একটা সময় কাজলী কেন্দ্রের অভিভাবকদের সভায় বলতে শোনা যেত - শিক্ষিকার বেতন প্রদান, কেন্দ্রের অবকাঠামো উন্নয়নের ব্যাপারে রিইব-কে দায়িত্ব নিতে হবে। পরে ধীরে ধীরে সেখান থেকে সরে গিয়ে শিক্ষিকা ও মায়েদের কাছ থেকে দাবি এসেছে বেশি বেশি শিক্ষিকা প্রশিক্ষণের বিষয়ে এবং কেন্দ্র পরিদর্শনের যা শিক্ষিকা-শিশু-মায়েদের উৎসাহ বাড়ায়। কাজলী মডেলে ইংরেজি শিক্ষা পদ্ধতি ও তার সুফল কাজলী কেন্দ্রের চাহিদাকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে।

করোনা পরবর্তী সময়ে কাজলী মডেল কেন্দ্রসমূহে রিইব-এর সহায়তা অক্ষুন্ন রাখার জন্যে প্রয়োজনীয় বৈদেশিক আর্থিক সহায়তা বন্ধ হয়ে যাবার ফলে অন্য অনেকের মত আমাকেও কাজ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। তবে অত্যন্ত

জরুরী এই কাজটি যাতে কোনোভাবে চালিয়ে নেয়া যায় তাই অচিরেই খানিকটা স্বেচ্ছাসেবা ও বাকিটা অল্প কিছু অর্থের বিনিময়ে আমি কাজটির সঙ্গে আবার সংযুক্ত হই, যা এখনো বলবৎ আছে। রিইব চেয়ারম্যানের ব্যক্তিগত উদ্যোগেই তা সম্ভব হয়েছে। সেই সুবাদে আমি এখন ঘরে বসেই টেলিফোনের মাধ্যমে শিক্ষিকাদের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রেখে চলেছি। প্রতিদিনই প্রায় দশজন শিক্ষিকার সঙ্গে ফোনালাপ করে জানি কেন্দ্রগুলো কেমন চলছে, কোথায় কী রকম অসুবিধে হচ্ছে, তার জন্যে কী ব্যবস্থা নেয়া যায় সে ব্যাপারে পরামর্শ দিচ্ছি। শিক্ষিকার পাঠাদানে কোনো অসুবিধে থাকলে সে বিষয়ে কথা হয়। অনেক সময় শিক্ষিকাকে বলতে শুনি, তিনি মাঠে কাজ করছেন। কেউ ধানের, কেউ আলু, কেউ তামাক আবার কেউবা আমবাগানে গাছের পরিচর্চায় ব্যস্ত থাকেন, তাই সুবিধে মতো সময়ে কেন্দ্রে পাঠদান করেন আবার কাজের মৌসুমে কাজের চাপ বেশি থাকলে কয়েক দিন কেন্দ্র বন্ধ রাখেন। কাজলী শিক্ষিকা যিনি হয়তো বেশি দূর পড়ালেখার সুযোগ পাননি, তিনি তার দৈনন্দিন সাংসারিক ও কৃষি কাজের পাশাপাশি বাড়িতেই শিশুদের লিখতে পড়তে শেখাতে পারছেন, ব্যাপারটি তার কাছে আনন্দ ও সম্মানের। কাজলী শিক্ষিকার পাশাপাশি মায়েদের সাথেও কথা হয়। কাজলী কাজের ব্যাপারে আমাকে সহযোগীতা করেন আর একজন সহকর্মী, জনাব মতিউর রহমান। তিনি উত্তরবঙ্গে বাস করেন, যেখানে বেশীরভাগ কাজলী কেন্দ্রই অবস্থিত। তিনিও খানিকটা স্বেচ্ছাসেবা ও খানিকটা অর্থের বিনিময়ে কেন্দ্রলোতে সশরীরে উপস্থিত হয়ে স্থানীয় সমাজের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখেন। এভাবে আমরা দুজন ও উত্তর বঙ্গের কয়েকজন স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক মিলে কেন্দ্রগুলোর মধ্যে সমন্বয় রক্ষা করে চলেছি। আগের মত বছরে কয়েকবার কয়েকটি দলে সব শিক্ষিকাদের একত্র করে তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা না করতে পারলেও এখন বছরে অন্ততঃ একবার সকলকে নিয়ে বসি। তাতে সকলে উদ্বুদ্ধ হয়। আরো বেশি আলোচনা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারলে ভালো হ'ত।

কয়েক বছর ধরে শিক্ষিকাদের সঙ্গে প্রায় প্রতিদিন যোগাযোগের মাধ্যমে দেখেছি শিক্ষিকারা পাঠদানে নিজেদের দক্ষতার উন্নয়নে ইদানীং আরো জোর দিচ্ছেন বিশেষত ইংরেজি বিষয়ে ভালো করার দিকে ঝোঁক দিচ্ছেন। শিক্ষিকা ও মায়েদের সাথে ফোনে যোগাযোগে পরিবারের সদস্যদেরও সহযোগিতা পাচ্ছি। জেনেছি যে কাজলী কেন্দ্রে শিশুদের আনন্দ, সহজে লিখতে পড়তে পারার বিষয়টি কাজলী শিক্ষিকাদের পাঠদানে আগ্রহ ও দক্ষতাকে তরাণ্বিত করে। তাছাড়া একজন শিক্ষিকার সামাজিক ও আর্থিক ক্ষমতায়নের কাজে কাজলী মডেল ব্যবস্থা বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। কাজলীতে যেহেতু খুব বেশি পড়ালেখা জানা শিক্ষিকার দরকার পড়ে না, তাই শিশুদের প্রতি দরদ-মমত্ববোধ আছে এমন কোনো গৃহবধূও কাজলী শিক্ষিকা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন। বর্তমানে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষিত অনেকে কাজলী মডেল সম্বন্ধে অবগত হয়ে এবং কাজলী মডেলের সহজ ও আনন্দময় পাঠদান

ও অতি সহজে ইংরেজি শেখার বিষয় জেনে ও উৎসাহী হয়ে নিজেদের উদ্যোগে নিজেদের গ্রামে কাজলী কেন্দ্র চালু করছেন ও অল্প সময়ে পাঠদানে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন।

গত দু'দশক ধরে কাজলী মডেল দেশের সমাজের সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের পাশাপাশি দলিত শ্রেণি, আদিবাসী সাওতাঁল শিশু, শহরের বস্তিবাসী শিশু, পোশাক তৈরি কারখানায় নিয়োজিত কর্মীর শিশুর শিক্ষায় বিশেষ অবদান রেখেছে। আগেই বলেছি এ দীর্ঘ সময়ে প্রায় দেড় লাখের মতো শিশু কাজলীতে পাঠদান সম্পন্ন করে, উচ্চ মাধ্যমিকের গণ্ডি পেরিয়ে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নসহ বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে লিপ্ত হয়েছে। এরা সবাই কাজলী মডেল শিক্ষার কাছে তাদের গভীর ঋণ অকপটে স্বীকার করে।

আগেই উল্লেখ করেছি, কাজলী মডেল সমাজ পরিচালিত একটি শিশুশিক্ষা ব্যবস্থা। বাইরের অনুদানহীন স্থানীয় সমাজ-কেন্দ্রিক একটি সামষ্টিক প্রচেষ্টা, যার মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের স্থানীয় সমাজের সাথে রিইব-এর নিঃস্বার্থ ও নিরলস সম্পৃক্তি দুদশকের বেশী সময় ধরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সমাজের অনেকের বুদ্ধি-পরামর্শ, সহযোগিতা ও সমণ্বয়ের মাধ্যমে কাজলী মডেল দেশের শিক্ষা খাতে অকিঞ্চিত অবদান রেখেছে। শিক্ষিকাদের পাঠদানের অভিজ্ঞতা, তত্ত্ব-তথ্যের সমণ্বয় ও নিরিক্ষণের ভিত্তিতে, রিইব সর্বদা মডেলটির উৎকর্ষতা বৃদ্ধিতে কাজ করে যাচ্ছে।

এক যুগের বেশী সময় ধরে কাজলী মডেলের সাথে কাজ করে আমার মনে হয়েছে, শিশুর শিশুত্ব বজায় রেখে শিশুকে স্কুলগামী ও আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তুলতে কাজলী মডেলের এই প্রয়াসের আরো সম্প্রসারণ প্রয়োজন, বিশেষ করে দেশের সেইসব এলাকায় যেখানে সরকারী বা বেসরকারী শিক্ষা ব্যবস্থা এখনো সহজলভ্য নয়। আমি চাই কাজলী মডেল আরো ছড়িয়ে পরুক। শিক্ষা-অনুরাগী যে কোনো ব্যক্তি নিজ অঞ্চলে বা দেশের যে কোনো স্থানে কাজলী কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নিলে রিইব তাঁকে সহায়তা প্রদানে প্রস্তুত। সমাজের নিজস্ব শক্তির এহেন ব্যবহার আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আর রিইব-এর সমন্বয় কাজের সঙ্গে যুক্ত হতে আমি সবাইকে সনির্বন্ধ আহ্বান জানাই। যাঁরা কজলী মডেল সম্বন্ধে আরো বিশদভাবে জানতে চান তাঁরা এই ওয়েবসাইটগুলো খুলে দেখতে পারেন। [www.kajoliecl.org, www.rib-bangladesh.org]

শারমিন আক্তার
কাজলী শিশু শিক্ষা মডেল, রিইব